তারিখ 14/4/79
পৃষ্ঠা 5 কলাম 9

গণশিক্ষা ও গ্রামোন্নয়ন

গণশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা তখনই আসে, যখন কোন দেশে ও সমাজে শিক্ষা হার অতি নগণ্য এ কোন দেশের আপামর জনসাধারণ নিরক্ষর, অজ্ঞ, অন্ধ হলে ভাব অবশ্যম্ভাবী ফলে অধিবাসীরা হয় দারিদ্র প্রপীড়িত, দুস্থ-ব্যাধি-গ্রস্ত। শিক্ষার এমন অভাব হলে সেখানে শক্তি অপচায়িত হবে, অব্যবহৃত থাকবে। আর মানুষের ধ্যান ধারণা, চিন্তাধারাও থাকবে নিতান্তই সেকেলে। সেখানে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নও হবে অত্যন্ত কঠিন কাজ। উন্নয়নের প্রথম শর্ত-হল—মানবোন্নয়ন। অর্থাৎ শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে আত্মউপলব্ধিতে, আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করতে না পারলে জীবন তার দুর্বিসহ হবেই। অথচ বিরাট সম্ভাবনা তার মাঝে ঘুমিয়ে আছে, আর শিক্ষার অভাবে সে কথা সে বুঝতে পারে না, ভাবতে পারে না। বাঙালী কবি যথার্থই বলেছেন; 'অমন মানব জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলত সোনা'।

চলতি শতাব্দীর প্রথম থেকেই মনীষিদের কণ্ঠ সোচ্চার 'গ্রামে ফিরে যাও' এই শ্লোগানে। গ্রামে, পল্লীতে যেমন লুকিয়ে আছে প্রাকৃতিক সম্পদ, তেমনি রয়েছে মানব সম্পদ। দুটোই বহুকাল রয়েছে অনাবিষ্কৃত, অব্যবহৃত। আজ নতুন করে বিশ্বের দিকে দিকে, বিশেষ করে এশিয়া, আফ্রিকা ও লেটিন আমেরিকায়, এ দু সম্পদের উন্নয়নপ্রসূত শুভ ফল লক্ষ্য করে আমরাও যেন সম্বিত ফিরে পেয়েছি। গণশিক্ষা ও গ্রামোন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছি। কোরানে পাকের প্রথম বাণী ইকরা—অর্থাৎ পড়ো মানুষের শিক্ষার অধিকার জন্মগত। 'জ্ঞান আহরণ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত'। হযরতের নির্দেশ, 'জ্ঞান অর্জন করা শিশু, বৃদ্ধ, পুরুষ, নারী সকলের জন্য ফরজ।' গণশিক্ষার বীজও ওখানেই আছে।

এ শতাব্দীতেই গণশিক্ষার ইতিহাস সৃষ্টি হয়ে আছে—চীনে, ইন্দোনেশিয়ায় ও অন্যত্র। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর চীনের হোপী প্রদেশে টেনশিয়াং জেলায় ডঃ জেমস ইয়েন যে পরীক্ষণ চালান তাতে প্রমাণিত হয় গ্রামের সার্বিক উন্নয়নে সকলের সমবেত শিক্ষার প্রয়োজন অত্যধিক। সাক্ষরতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন, ক্ষুধা নিবৃত্তির উপায় কি? তারা উৎপাদনে লেগেছে, খাদ্য বাড়িয়েছে, পালন করেছে শূকর, হাঁস-মোরগী, মেনে চলছে স্বাস্থ্য বিধি, খেয়েছে পুষ্টিকর খাদ্য। সাক্ষরতার জন্য প্রাইমারী স্কুলের মেয়েরাও নিয়েছে গ্রামের নিরক্ষর মেয়েদের শিক্ষার ভার। প্রাইমারী স্কুলে গড়ে উঠেছে পল্লী পাঠাগার। স্কুল হয়েছে গ্রাম-মিলনায়তন, সামাজিক প্রতিষ্ঠানে গণশিক্ষার প্রাণ কেন্দ্র। পরে ১৯৫০—৬২ পর্যন্ত তিনটি পর্যায়ের শেষবারের নির্দেশ ছিল, 'লিপ ফরওয়ার্ড মেভমেন্ট', 'দ্রুত এগিয়ে চল।' তারা এগিয়ে গিয়েছে। সাক্ষরতা থেকে উৎপাদনশীলতায়, নবতর সৃষ্টিধর্মিতায়। রাষ্ট্রীয় নির্দেশে গ্রামোন্নয়নের প্রবাহ ছুটেছে ত্বরিত গতিতে।

সুকর্নের ইন্দোনেশিয়ায় জগর-পের জেয়ার আনল সাক্ষরতা ও সমাজ উন্নয়নের অভিযান চালিয়ে। ১৯৬০ সালে তা রূপ নিল গণশিক্ষা অভিযানে। আমাদের সামনে প্রশ্ন ব্যক্তি বিশেষ বা বিশেষ প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টায় বিশেষ অঞ্চলে পরীক্ষণ চলতে পারে। অতীতে চলেছেও, সফলও হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যর্থও হয়েছে। কবির কথায় তাও ব্যর্থ নয়, ব্যর্থতার মাঝেই সফলতার জন্ম। শিক্ষার বিষয় বলেছেন কবি—যে ফুল না ফুটিতে/ঝরেছে ধরণীতে/ যে নদী মরু পথে/ হারাল ধারা/ জানি হে জানি/ তাও হয়নি হারা।

পল্লী উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন সরকার। পল্লী উন্নয়নের ডাক আজ ধ্বনিত প্রেসিডেন্ট থেকে সবার কন্ঠে। বছরের পর বছর চলেছে এ বিষয়ে সেমিনার ও আলোচনা সভা। সুপারিশও স্বীকৃত হয়ে আছে। অতীতের দিকে তাকালে দেখা যাবে, গ্রামোন্নয়নের জন্যে সেকালেই অনেকে চেষ্টা করেছেন। ১৯৩৫ সালে শুরু হয় বগুড়া জেলায় নুরুন্নবী চৌধুরীর দ্বারা। এসডিও হাফেজ মোহাম্মদ এসহাক সিরাজগঞ্জে পল্লী মঙ্গল সমিতি গঠন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান আর সমবায় আন্দোলন শুরু করেন। তার পর সৃষ্ট হয় সরকারের পল্লী পুনর্গঠন বিভাগ। সে চাল্লিশ বছর আগের কথা। ১৯৫৪-৫৫ সালে গ্রাম কৃষি শিল্প উন্নয়ন বিভাগের পল্লী কর্মীরা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু অকস্মাৎ ১৯৬০-৬১তে তা বন্ধ হয়ে যায়। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ১৯৫৯ সাল থেকে পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কে চালাচ্ছে প্রশিক্ষণ, গবেষণা, অনুসন্ধান, পরীক্ষণ। পরীক্ষণ ক্ষেত্র কুমিল্লা কোতয়ালী থানা। অন্যত্রও সম্প্রসারিত। ১৯৫৬। এক সময় কোতয়ালী থানার রামপুর, শ্রীমন্তপুরের লোকেরা অজন্মা, অন্নাভাবে দারুণভাবে ভুগ-ছিল। উন্নয়নমূলক শিক্ষার সুযোগে আজ তারা খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ। কৃষক শ্রমিক সমবায় গঠন করে জীবিকা অর্জনের নতুন পথ আবিষ্কার করেছে।

বাংলাদেশ বিশেষত পল্লী এখনো নিরক্ষরতার অন্ধকারে নিমগ্ন। ৬ষ্ঠ শ্রেণী ও তদুর্ধের শিক্ষিতের হার ২২.২-এর মধ্যে মাত্র ৫/৬ জন। বাকি সাক্ষর শিক্ষিতেরা পাঠশালার বিভিন্ন শ্রেণী পর্যন্ত পড়া। তাদের অর্জিত স্বল্প বিদ্যাচর্চার অভাবে, সংরক্ষণের দীনতায় হারিয়ে যাচ্ছে। তারা বৃহত্তর নিরক্ষরদের শামিল হয়ে গড্ডালিকা প্রবাহে চলেছে। সমাজে নিরক্ষর নারীর সংখ্যাই বেশী। এইতো এদেশে পল্লী শিক্ষাচিত্র। সে জন্যই গণশিক্ষার কথাটা উঠেছে। গণের মধ্যে রয়েছে আবাল বৃদ্ধ বণিতা, অর্থাৎ এ শিক্ষার আওতায় আসছে শিশু, কিশোর, যুব, প্রৌঢ়, এমন কি বৃদ্ধ। মনে রাখতে হবে শিক্ষার সময় যে 'দোলনা থেকে কবর তক।'

মানুষ আজ বাঁচার তাগিদে সংগ্রাম করছে। কঠোর বর্তমানের মোকাবিলায় সবাই ব্যস্ত। অর্থাভাব, খাদ্যাভাব, কর্মাভাব, সর্বোপরি শিক্ষাভাব মানুষকে বিব্রত করছে। জনগণের খাদ্যাভাব মিটাতে রাষ্ট্র হিমসিম খাচ্ছে। এ সম্পর্কে ডঃ ফ্রাংক লুবাকের একটি উক্তি মনে পড়ছে। তিনি বলছেন—মানুষকে শিক্ষিত করুন, সে নিজেই বেছে নেবে তার বাঁচার পথ। তার জন্য রাষ্ট্রের মাথা ঘামাতে হবে না। অনেক দেরীতে হলেও আজ তার অর্থ সুস্পষ্ট। তাই বুঝি আজ গণশিক্ষার জন্য আবেদন, প্রচেষ্টা।

এখন দেখতে হবে শিক্ষা কাদের জন্য মুখ্য, কাদের জন্য গৌণ। অথবা গৌণ-মুখ্যের কথা নয় সবার জন্য সমান এবং যুগপৎ। মনে হয় এর

মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস

তারিখ 14/4/79
পৃষ্ঠা 5 কলাম 4

জন্য স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী সীমা রাখা ভাল। জন বিভাগ হতে পারে নিম্নরূপ ৬—১৪, ১৫—২৫, ২৬—৪০, ৪১—৫৫। এর মধ্যে ৬—১৪র বয়সীদের লেখাপড়া চলবে। প্রচলিত স্কুল আওতায়। ১০—১৪র মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্রভাবে অথবা স্থানীয় হাইস্কুলসহ শিক্ষার মাধ্যমে। ১৫—২৫ উঠন্ত বয়সের যৌবন দীপ্ততায় আবেগ প্রবণ এবং নতুনকে গ্রহণ করার অগ্রণীদের জন্য চাই অনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক বাস্তবধর্মী, ব্যবহারিক, কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা, যা আজ শিখে আজই কাজে লাগাতে পারবে। এদের মাঝেই সৃষ্টি হবে নতুন নেতৃত্ব। তারাই হবে নতুন সমাজ ব্যবস্থার অগ্রদূত।

এ দলটিকে সর্বাগ্রে শিক্ষিত করতে হবে। তারাই দেবে নতুন নেতৃত্ব। ২৬—৪০ বয়সের যারা জীবনের মধ্য পথে সংসার ধর্মে জড়িয়ে সমস্যায় নেতিয়ে পড়েছে তাদের জন্য পেশা ভিত্তিক অর্থকরী শিক্ষা বিশেষ ফলোদায়ক হবে। আর শেষোক্ত ৪১—৫৫র জন্য জীবন কেন্দ্রিক সমস্যা সমাধানের শিক্ষা। সমাজতত্ত্ববিদদের মতে বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় সর্বত্র এ দলটির মধ্যে রয়েছে গ্রামের সর্দার ও তার সমবয়সীদল। এদের নিয়েই সমস্যা বেশী। একদিকে রক্ষণশীলতা অন্যদিকে তাদের একাধিপত্য তারা ছাড়তে নারাজ। নতুনকে গ্রহণ করতে চায় না। এমনকি নতুন নেতৃত্বের সৃষ্টিকেও দমন করে রাখতে চায়। এরা কায়েমী স্বার্থবাদী এবং উন্নয়নের পথে অন্তরায়। এদেরকে পুনঃপৌনিক শিক্ষণের মাধ্যমে উন্নয়ন অনুরাগী করতে হবে। তাদের দৃষ্টি ভঙ্গি ও চিন্তাধারা পরিবর্তনই সর্বাধিক কঠিন কাজ। ১০—৩০ বয়সের নারীদের জন্য বিশেষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, কুটির শিল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্র আয়ের সংজনীমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা অপরিহার্য।

দ্বিতীয় আর একটা বিভাগও মনে রাখতে হবে। গ্রামে রয়েছে বড় চাষী, ক্ষুদ্র চাষী, ভূমিহীন চাষী ও কায়িক শ্রমিক বেকার। শেষোক্ত দলে পরনির্ভরশীল পুরুষ নারী দুই-ই আছে। বয়সের হিসাবে যেমন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন, শ্রম কাজের বিভাগেও তা অনুরূপভাবে প্রয়োজ্য। ভাগ্যহীনদের জন্য গণশিক্ষায় এমন অর্থকরী শিক্ষা সংযোজিত করতে হবে যেন তাতে তার বাঁচার নতুন পথের সন্ধান পায়। সংঘবদ্ধ সমবায়ে তাদের জন্য শুভ সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মকেন্দ্রিক বয়স্ক শিক্ষা তাদের জন্য অপরিহার্য।

এবার দেখতে হবে শিক্ষা দেবে কোথায়, এবং কি? স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গ্রামে রয়েছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল, মাদ্রাসা, ফোরকানিয়া ও মসজিদ। সর্বাগ্রে এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও ইমামদের টেনিং দিয়ে নতুন প্রেরণা ও নতুন নেতৃত্বের সৃষ্টি করতে হবে। শিক্ষক সমাজকেই নিতে হবে দায়িত্ব নেতৃত্ব। এখানেও সমস্যা। শিক্ষক সমাজ সবকিছু বুঝে। কিন্তু পরিবর্তিত হতে চায় না। তারা শ্রেণী কক্ষের শিক্ষক, পল্লীর শিক্ষক নয়। স্কুলের বাইরে তাদের কাজ নেই—এ ধারনা ত্যাগ করে সমাজ সেবকের ভূমিকায় তাদের নেমে আসতে হবে। সে জন্যই স্কুলকে কমিউনিটি স্কুলে রূপান্তরিত করার কথা উঠেছে। এবং তা আশু প্রয়োজন। কারণ শিক্ষক সমাজ শিক্ষকও বটে। অন্তত পাঁচ বছরের জন্য। জনগণকে শিক্ষায় শিক্ষিত করা পর্যন্ত। তবেই তারা বিপ্লব আনতে পারবে। কিন্তু শিক্ষকদের শিক্ষার ভার নেবে কে। কোথায় সে অনুপ্রেরণাদানকারী শিক্ষকদের শিক্ষক। তাও আবিষ্কার করতে হবে।

দ্বিতীয় এবং অর্থকরী প্রতিষ্ঠান কৃষি সমবায়। দেশের ২৫০টি সমন্বিত পল্লী এলাকায় তা ছড়িয়ে আছে। সমবায় ক্ষেত্রে কুমিল্লার নজির আপাতত যথেষ্ট, যদিও তা সম্পূর্ণ দোষমুক্ত নয়। প্রতিটি সমবায় হবে শিক্ষা ইউনিট। প্রত্যেক সদস্য নিজে শিক্ষিত হবে আর তার পরিবারকে শিক্ষিত করার দায়িত্ব নিবে। সমবায়বিহীন প্রতি গ্রামে থাকবে গণশিক্ষা সংঘ আর, বয়োজ্যেষ্ঠদের সমর্থনে নেতৃত্ব দিবে যুব সমাজ।

মেয়েদের শিক্ষাভার থাকবে কিনডার স্কুল ও প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষিকাদের উপর। তারা কাজ করবে দু শিফটে সকালে ২½ ঘন্টা শিশু ও প্রাথমিক শ্রেণীর বাচ্চাদের নিয়ে আর বিকালে ৩—৫টা পর্যন্ত গ্রামের ৮—৪৫ বয়সের মেয়েদের নিয়ে। তাদের পাঠক্রম ব্যবহারিক লিখন পঠন, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, সমবায় কুটিরশিল্প ও অনুসঙ্গিক অন্যান্য। হাইস্কুলের ছাত্রী ও গ্রামের শিক্ষিতা মেয়েরাও তাদের সাহায্য করবে। এতেই নারীদের মধ্যে বেরিয়ে পড়বে নতুন নেতৃত্ব।

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

জনশিক্ষা

(৫-এর পৃঃ পর)

আর যে দলটি আন্দোলনকে জোরদার করে ঘরে তরঙ্গের সৃষ্টি করতে পারে তারা হলেন ছাত্র সমাজ। তাদের কাজ দ্বিবিধ—নিজেরা শিখবে তাদের বাড়ির পরিবারের লোকদের স্বাক্ষর ও শিক্ষিত করবে। এটা টিপসই বিলোপে সপ্তাহ পালনে সীমিত থাকবে না। হবে সাক্ষরতার পথে প্রথম ধাপ। একাধিকক্রমে দু থেকে তিন বছর ধীরে অসীম ধৈর্য নিয়ে লেগে থাকতে হবে। স্থায়ী ফল পেতে হলে অন্তত পাঁচ থেকে দশটি বছর অক্লান্ত সাধনা ও অবিরাম শিক্ষা প্রয়োজন। যুগ ধারা বুঝতে, নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করতে সময় ও সুযোগ দিতে হবে। বুঝতে হবে পরিবর্তন হচ্ছে, হবে। পরিবর্তন অপরিহার্য, চিন্তায়, কাজে। আচার আচরণে, অভ্যাসে জীবনের সর্বক্ষেত্রে। প্রবহমান পরিবর্তনশীল জীবনে, 'সর্টকাটের' স্থলে মূল্যহীন, না হলেও বিশেষ ফলোদায়ক নয়। কারণ সবচেয়ে কঠিন কাজ মানুষের মনোভাবের পরিবর্তন, চিন্তাধারার বিবর্তন, নব নব কর্মধারায় সৃজন ও জীবন ধারার নবায়ন।

গণশিক্ষাকে গণআন্দোলনে পরিবর্তন করতে রাষ্ট্রীয় সমর্থন নির্দেশ থাকাও অপরিহার্য।